আছে পান্থধাম

লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মিতা মজুমদার

ইনস্টিটিউটে আসার প্রসঙ্গে মহারাজ বলতেন, "১৯৭৩-এ যখন এলাম, সে কী বিশৃঙ্খলা এখানে। সেসবও কাটল। আয় অনেক বাড়ল। ঠাকুর, মা দেখাচ্ছেন একটা নগণ্য তৃণ থেকে কী করা যায়। সত্যিই যা চাই, ঠাকুর-মা তাই করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কত পরিকল্পনাই না মাথায় আসে। আবার ভয় হয়। এখন ঠাকুরকে বলি, ঠাকুর, তুমি আমার হাত ধরে বসে থাকো। আমায় ছুঁয়ে থাকো তুমি। আমি মাঝে মাঝে তোমায় দেখি। তুমি খুশি হও এমন কাজই শুধু করি।"

মহারাজ তাঁর কর্মতৎপরতা, আধ্যাত্মিকতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যক্তিত্বের সৌকর্যে ইনস্টিটিউট অফ কালচারকে একটি উদার আধ্যাত্মিক তথা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত, বহু গুণী মানুষকে হৃদয়ের অকৃপণ ভালবাসা দিয়ে একত্রিত করেছিলেন। এছাড়া ভারততত্ত্ব, গবেষণা বিভাগ, বিবেকানন্দ আর্কাইভ, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি প্রভৃতির বিস্তার, বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশনা, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কল-এর কাজকর্ম গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া, সর্বোপরি অগণিত সাধারণ মানুষকে জীবনের চরম লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার নিরন্তর প্রেরণা দেওয়া—এগুলিই তাঁর অসামান্য কীর্তি। অক্লান্ত কর্মী ছিলেন মহারাজ। আশ্চর্য সব স্বপ্ন দেখতেন। একদিন বললেন, "একজন সেদিন বলল কি জান? বলল, 'আপনি শখ করে কাজ বাড়ান।' তাকে বললাম না কিছু। আসলে ঠাকুরের কাজে আমার ক্লান্তি হয় না যে মোটে। কী করি!"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা

১৬৩।

১৯৮৯-এ আমেরিকা থেকে ফিরে মহারাজ একদিন বললেন, "এবার আমেরিকায় এমন শক্তি হয়েছিল যে, যা বলতাম লোকে থ হয়ে শুনত। এখন কিন্তু সে-শক্তিটা আর নেই।" লাজুক হেসে বললেন, "তোমাদের বলে ফেললাম। দেখো, আমি কিন্তু খুব লাজুক। তাই এসব দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই।" তারপরই ভাবগম্ভীর হয়ে বললেন, "মূকং করোতি বাচালম্—একথার সত্যতা আমাকে দেখে বুঝবে।" এই কথাটি বহুবার আন্তরিকভাবে তাঁকে বলতে শুনেছি। বাস্তবিক, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, সম্মেলন ও আলোচনাচক্রে যোগ দেওয়ার জন্য দেশ-বিদেশে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন; তাঁর অনবদ্য ভাবোদ্দীপক কথা শুনে অগণিত মানুষ মুগ্ধ হয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন; কত মানুষের জীবনধারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে—কিন্তু মহারাজ কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি এ-কৃতিত্ব তাঁর। বলতেন, "অভিমানশূন্যতাই হচ্ছে ধর্ম।" তিনি ধর্মের এই সংজ্ঞার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন।

১৯৯৩ সালে স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হবে। সেই সেন্টিনারি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মহারাজ। ইনস্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্ম বজায় রেখেই ওই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি করে চলেছেন। এ আমরা দিনের পর দিন দেখেছি। স্নান-খাওয়ার ঠিক নেই। যখন-তখন বেরিয়ে যাচ্ছেন। বৃদ্ধ শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেসব দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভক্তদেরও স্বামীজীর সেবায় লাগিয়েছেন। চাঁদা তোলার ভার যাঁদের দিচ্ছেন, তাঁদের বলছেন, "দেখো, কেউ হয়তো দেবেন, আবার কেউ হয়তো অপমান করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবেন। তোমরা কিন্তু ওসব গ্রাহ্য কোরো না।" হাতটা বাড়িয়ে যেন কিছু সরিয়ে দিচ্ছেন এই ভঙ্গিতে বলতেন, "উপেক্ষা, উপেক্ষা। কাজ করে যাও। ঠাকুর, মায়ের কাজ করে ধন্য হয়ে যাও। জান তো, স্বামীজী আশীর্বাদ করেছেন—'তোরা খেটে খেটে মরে যা।' আচ্ছা বলো দেখি এ কেমন আশীর্বাদ! এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে?" এই কথা বলতে বলতে স্বামীজীর চিন্তার তড়িৎস্পর্শে গর্বে, আনন্দে, ভালবাসায় মহারাজের মুখখানি প্রদীপ্ত হয়ে উঠত!

এইভাবে নিজেও মেতেছেন, অন্যদেরও মাতিয়েছেন। পুরোদমে কাজ চলছে। উৎসবের আর অল্পদিন বাকি। ইতোমধ্যে একদিন অফিসঘরে গিয়ে দেখলাম মহারাজ একটু চিন্তান্বিত। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, একটা বিরাট অঘটন ঘটেছে। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে যেসব প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা প্রথমে যেখানে হয়েছিল সেখান থেকে জানানো হয়েছে যে তাঁরা জায়গা দিতে পারবেন না। স্বভাবতই ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কী হবে মহারাজ?" প্রশ্ন করা মাত্রই মহারাজ ডানদিকে ঠাকুর, মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, "দেখো, এ-কাজ যদি এর (নিজেকে দেখিয়ে) হয়, তাহলে ভরাডুবি হবে, আর এ-কাজ যদি ওঁদের (ঠাকুর, মাকে দেখিয়ে) হয়, তাহলে তা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে।"

এরপর কয়েকদিন ধরে স্নান-খাওয়া ভুলে ঝড়ের বেগে ছোটাছুটি করলেন মহারাজ। তারপর একদিন বললেন, "ঠাকুরের দয়ায় পাঁচ হাজার ডেলিগেটস্-এর থাকার ব্যবস্থা এবং একশো পঞ্চাশ জন বক্তার রিসেপশনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। শেরিফ এবং মেয়রও এগিয়ে এলেন।"

ওইসময় লেখা দুটি চিঠি পড়লে বোঝা যায় কী ঝড়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে পথ চলতে হচ্ছিল। লিখছেন (১৫ জানুয়ারি ১৯৯৩), "আমি ঝড়ের এঁটো পাতার মতো ঘুরপাক খাচ্ছি। শরীর মনের

অবস্থা অনুমান করতে পার।... আমি বড্ড ক্লান্ত। তবু সকালে এক সভায় কিছু বলতে হবে। সভা এখানেই।..." আর একটি চিঠিতে লিখছেন (২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩), "আমার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খবর এসেছে প্রেসিডেন্ট আসবেন না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! আজ দুদিন কী যে কষ্টে সময় কাটিয়েছি, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না।... কিন্তু হঠাৎ প্রেসিডেন্টের মত পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয়। কাল রাত প্রায় ৯-৩০ মি.-এ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে টেলিফোন এসেছে। আজ সঠিক খবর পাব আশা করছি।..."

এরপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অগণিত মানুষ দেখলেন কেমন করে বেলুড় মঠের ইতিহাসে সংযোজিত হল সর্বাঙ্গসুন্দর অসামান্য আর-একটি অনুষ্ঠান। দিনের পর দিন সিংহবিক্রমে নিজের সর্বশক্তি উজাড় করে কাজ করলেও অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে কিন্তু মহারাজ পিছনের সারিতে নিজেকে প্রায় মুছে দিয়েই শান্তভাবে দ্রষ্টার মতো, সাক্ষীর মতো বসে রইলেন।

এই আশ্চর্য কর্মযোগী কখনও এতটুকু সময় নষ্ট করতেন না। সকাল-সন্ধ্যায় অফিস ঘরে বসতেন। মহারাজ বলতেন, যেদিন কম ভিজিটর থাকে সেদিন পনেরো, আর যেদিন বেশি সেদিন অন্তত পঞ্চাশ। এই অগণিত দর্শনার্থীর সঙ্গে প্রেরণাপ্রদ কথা বলছেন, তাঁদের নানাধরনের কথা হাসিমুখে শুনছেন, মঠ-মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের ফোন, দেশি-বিদেশি ভক্তদের ফোন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ অফিসারদের ফোন ধরছেন, আবার নিজেও তাঁদের ফোন করছেন, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সেই বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন, মিটিং করছেন, তারই ফাঁকে ফাঁকে ইনস্টিটিউটে তো বটেই, বাইরে বক্তৃতা দিচ্ছেন, লিখছেন। লেখার বিষয়বস্তু দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতাম! প্রবন্ধ লিখছেন, স্বামী শিবানন্দের পত্রাবলি ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন, নয়তো গীতা, উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্রের মতো দুরূহ শাস্ত্র নিয়ে কাজ করছেন। শেষ কয়েক বছর উপনিষদেই ডুবে থাকতেন তিনি। বলতেন, "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উপনিষদের স্বপ্ন দেখি।" নয়টি উপনিষদের সহজ সরল অনুবাদ করেছিলেন।

পূজনীয় স্বামী অসক্তানন্দজী বলেছিলেন, একবার তিনি মহারাজের কাছে গিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বলছেন। ব্রহ্মসূত্রের ওপর লিখছিলেন মহারাজ; মাঝপথে লেখা থামিয়ে শুনছেন। বলা শেষ হলে দরজার কাছে এসে জুতো পরতে গিয়েই অসক্তানন্দজীর মনে পড়ল, আর একটা কথা তো বলা হয়নি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখলেন, সেই অসমাপ্ত লাইনটি শেষ করে আর একটি লাইনও লেখা হয়ে গেছে মহারাজের। পরে উনি বলেছিলেন, "এ-দৃশ্য অভাবনীয়!"

মনের প্রভু ছিলেন মহারাজ। বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ শরীরেও কখনও শুয়ে বসে সময় কাটাননি। ১৬ আগস্ট ১৯৯৬-র একটি চিঠিতে লিখছেন, "আজ আমি একটু ভাল আছি। জ্বর এখনও আসেনি। ক্লাস করব না, আগেই বলে দিয়েছি।... আসছে মঙ্গলবার থেকে ক্লাস করতে পারব আশা করছি। আজ আমি আবার ছান্দোগ্যতে ফিরে এসেছি। সমস্ত সকাল কাটিয়েছি অনুবাদ করে। এখনও অনুবাদ করছি। খুব আনন্দ পাচ্ছি।"

বার্ধক্য, অসুস্থতা কোনওকিছুকেই গ্রাহ্য করতেন না এই কর্মযোগী। জীবনের শেষ বেলাতেও কত কাজ করেছেন। দু-তিনটি ঘটনা বলি। ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে মহারাজ জার্মানি যান। সেখানে হামবোল্ড ইউনিভার্সিটি রামকৃষ্ণ ।৬৫।

মিশনের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে-অনুষ্ঠান করেন, তাতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর পেটে কয়েকটি পলিপ দেখা গিয়েছিল।

জানুয়ারি মাসে নিউক্যাল জেনারেল হাসপাতালে মহারাজের লেজার সার্জারি হয়। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন এমন সময় খবর এল যে রাজ্য সরকার বেদীভবনের জমি অধিগ্রহণ করবে আর তার এক-তৃতীয়াংশ মিশনকে দেবে। ঠাকুরের আর একটি কাজ করার স্বপ্ন তাহলে রূপায়িত করতে পারবেন—এই আনন্দে আর কোনওদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন দেশে। আর তাতেই বিপত্তি হল। দিল্লিতে পৌঁছতেই অপারেশনের জায়গা থেকে প্রচুর রক্তপাত শুরু হল। 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স'-এ মহারাজকে ভর্তি করা হল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, যে-ব্রহ্মচারী মহারাজের ঘরে ছিলেন তিনি রাতে শুনতে পেলেন মহারাজ খুব আস্তে আস্তে কী যেন বলছেন। কাছে গিয়ে কান পেতে যা শুনলেন তাতে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, আবার একই সঙ্গে আশার আলোও দেখতে পেলেন। শুনলেন মহারাজ বলছেন, "ঠাকুর, সূর্যমুখী ফুলের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছি কখন তোমার কাছে আসব। তোমার আর-একটা কাজ শেষ হলেই আমি আসছি।" আশ্চর্যের ব্যাপার, পরের দিন থেকেই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন তিনি। কলকাতায় ফিরেও এলেন। বহুদিনের চেষ্টার ফলে বেদীভবনের সেই জমিও, বিপক্ষ দলের আপিলে সাময়িকভাবে স্টে অর্ডার পেলেও, অবশেষে মিশনের হল।

এরপর ১৯৯৮ সালের ৩, ৪, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন শতবার্ষিকীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল। মঠের আদেশে অনুষ্ঠানের আহ্বায়কের দায়িত্বও সুচারুরূপে পালন করলেন মহারাজ। নভেম্বরে শেষবারের মতো কামারপুকুর ও জয়রামবাটী গেলেন। কামারপুকুরে ঠাকুরকে প্রণাম করছেন আর দুচোখ বেয়ে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। জয়রামবাটীতে সন্ধ্যারতির পর মায়ের কথা বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গেলেন। মায়ের দিব্য উপস্থিতির স্পর্শে সবাই ধন্য হলেন।

একদিন সারদা মঠের পূজনীয়া প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী ও সদাত্মপ্রাণাজীর সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছি। তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। একটি লেখা চাইতে তাঁরা মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন সেদিন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ তাঁদের বললেন, "সন্ন্যাসীর তিনটি জিনিস অভ্যাস করতে হয়। এক, সততা। দুই, মন মুখ এক করা। তিন, নিরভিমানিতা। অভিমান এক মারাত্মক ব্যাধি। এটা জয় করতে হবে। স্বামী মাধবানন্দ তখন মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক। মঠে আরাত্রিকের সময় তিনি দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসতেন। একটা জরুরি চিঠি সই করাব বলে দৌড়ে আসছি। তাঁর ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে অপেক্ষা করছি। পরে দরজা খুলে আমাকে দেখেই বললেন, 'কতক্ষণ এসেছ? ডাকনি কেন?' কারণ বলতেই একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি কি সমাধিস্থ হয়েছিলাম যে আমাকে ডাকলে না? তুমি তো এসেছ ঠাকুরের কাজ করতে!' এই হচ্ছে নিরভিমানিতা।"

এই নিরভিমানিতার প্রভায়, অনাসক্তির দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করতেন মহারাজ। দেখেছি কতজন তাঁর কাছ থেকে লেখা নিয়ে যেত। তা আদৌ ছাপা হল কী না, লেখাটি কাটছাঁট করা হল কী না, সেসব কখনও চেয়েও দেখতেন না। *ক্রমশ*

১৬৬।